Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-3 Issue-1 July 2024

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথাকার মহাশ্বেতা দেবী: নকশাল আন্দোলনের আখ্যানে

বিদিশা সিন্‌হা

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/07/12_Bidisha-sinha.pdf

সারসংক্ষেপ: ষাট সত্তর দশকের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা উপন্যাসের ধারায় মহাশ্বেতা দেবীর প্রতিবাদী লেখনীর পরিচয় বর্তমান লেখায় আছে।

সূচক শব্দ: বিশ শতক, রাজনীতি, বামপন্থার নানা দ্বিধা, নকশাল আন্দোলন, হাজার চুরাশি, ব্রতী, সুজাতা, গ্রামীণ কৃষি আন্দোলন, বসাই টুডু, শেষ প্রশ্ন

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে উপনীত আমরা। ফিরে তাকালে দেখব বিশ শতকের প্রথমার্ধ (১৯০০-১৯৫০) দুটো বড়ো বিশ্বযুদ্ধের যুগান্তকারী অবক্ষয়ের ইতিহাস। আরো বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী এই সময়কাল। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর কম্যুনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন, ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা, এরপর নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টির অগ্রগতি। অন্যদিকে ১৯৪৭এ ইংরেজ শাসনের অবসান এবং দেশবিভাগ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করল।

দেশবিভাগের অনতিপূর্বে ও পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তেতাল্লিশের মন্বন্তর আর ছেচল্লিশের দাঙ্গাও আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণার শতকিয়া। বিশ শতকের শেষার্ধ (১৯৫০-২০০০) দাঙ্গা-বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ ইতিহাস দিয়ে শুরু। ১৯৫২র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২র ভারত-চিন যুদ্ধ সাময়িক জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করেছে শুধু নয়, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও মতাদর্শগত বিভেদ সৃষ্টি করে পার্টিকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। স্বভাবতই ১৯৬০এর দশকের শেষের দিকেই রাজনৈতিক সন্ত্রাস দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৬৭ সালের ২৭মে নকশালবাড়ি গ্রামে ন'জনের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। ১৯৬৯ সালে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত নয়। আবার কানু সান্যালের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (CPI-ML) (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট) তৈরি হয়। ঘোষিত হয় "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।" অসংখ্য তরুণ তাজা প্রাণের আত্মবিসর্জনের এই যন্ত্রণা দীর্ঘ সময়ে আপাতত শান্তি কল্যাণ স্থাপিত হয় ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসন আসার পর। অভাব-অপচয়-লোভ আর লাভের এই হিংসাত্মক অশান্ত পরিবেশের অন্তঃস্থলে ফল্গুস্রোতের মতো প্রবহমান থাকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সংঘাতের ধিকি ধিকি অগ্নিধারা। প্রসঙ্গত, ১৯৩১ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধের এক বিশেষ অংশ উল্লেখ্য —

> **বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বাংলাদেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখন নামি, ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সামলানো অসাধ্য হয়ে ওঠে।**

এটাই ছিল প্রকৃত বাস্তব বা ground reality। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা রাম-মন্দির নির্মাণের বহুচর্চিত ও বহুবিতর্কিত প্রসঙ্গ। সব মিলিয়ে বিশ শতক প্রায় পুরো সময়টাই বাঙালি জীবনের চরম সঙ্কটকাল — কখনো কম, কখনো বেশি। বাইরের জীবন পরিকাঠামোয় চলছিল যে যুদ্ধ — মন্বন্তর দাঙ্গা দেশভাগ, অন্তর্জীবনেও তার প্রতিফলন গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। সম্ভবতই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজ এবং সামাজিক মানুষের জীবনচর্যায় আঘাত-প্রতি-আঘাতের চলমান। হতাশা-একাকীত্ব ও নিরর্থকতাবোধে আক্রান্ত বাঙালি কথাসাহিত্যিকদেরই একজন মহাশ্বেতা দেবী (জন্ম ১৪ জানুআরি, ১৯২৫, মৃত্যু ২৮ জুলাই, ২০১৬)। তিনি একাধারে লেখক, আদিবাসী ও মানবাধিকার আন্দোলন কর্মী, ব্যতিক্রমী এক বুদ্ধিজীবী এবং উপন্যাস, ছোটোগল্প,

নাটক, প্রবন্ধের রচনাকার। লেখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তাঁর নিজের উক্তি —

> **আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা; এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলে তাদেরই হাতে লেখা।**

বর্তমান নিবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪) এবং 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৯২) নিয়ে শহর ও গ্রামে অভ্যুত্থিত নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিত নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। বিশ শতকের ৬০-৭০ দশকের সবচেয়ে বেশি হিংসাত্মক আন্দোলনে সচেতন মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতা বা দ্বন্দ্ব ঠিক কোথায়, সেই দিকটা তুলে ধরাই বর্তমানে লেখার মূল অভিপ্রায়।

এই সময়কে নিয়ে সব লেখাই প্রত্যক্ষতা নির্ভর। কলকাতা কেন্দ্রিক জীবনের সমস্যা, গ্রামের কৃষকদের বিপন্ন অবস্থা, উদ্বাস্তু সমস্যা, জীবিকা সঙ্কট, জনসাধারণের একাংশের মধ্যে সঠিক রাজনৈতিক মতাদর্শের অভাব — এই সব কিছু শিক্ষিত মানুষকে ভাবতে বাধ্য করেছে, কোন্ পথে সঠিক সমাধান আসবে। শিক্ষিত তরুণদের মধ্যেই সশস্ত্র-বিপ্লবের ধারণা সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৭-১৯৭২ — এই পাঁচবছর সময়সীমাকে নকশাল আন্দোলনের সময়সীমা ধরা যেতে পারে। ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে তরাইয়ের নকশালবাড়ি অঞ্চলে নকশাল আন্দোলনের সূচনা। এই বছরই কংগ্রেসের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের জয় — মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৭র সাধারণ নির্বাচনের পর সি.পি.আই. (এম) যুক্তফ্রন্টের সরকারে যোগ দিলে চরমপন্থীরা চূড়ান্তভাবে হতাশ হলেন — পার্টিতে ভাঙন শুরু হলো এবং এই ভাঙন সম্পূর্ণ হলো ১৯৬৯এ — সি.পি.আই.(এম) থেকে নকশালবাদীরা বেরিয়ে গেল। নতুন ঘোষণাপত্রে মাও-সে-তুঙ্‌এর চিন্তাধারায় আন্দোলনের কথা ভাবা হয়।

সারা ভারত বিপ্লবী সমন্বয় কমিটি চারু মজুমদারের মতানুসারে ১৯৬৯এর ২২ এপ্রিল (লেনিনের জন্মদিনে) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলে। পার্টি গড়ার সময়েই সি.পি.আই.এর (এম.এল.) সদস্যদের সঙ্গে চারু মজুমদারের মতানৈক্য ঘটে কোনো কোনো বিষয়ে। বিশেষ করে ১লা মে-র সভার সভাপতি অসিত সেনের সঙ্গে চারু মজুমদারের মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। শ্রীসেন বলেছেন —

> **ব্যক্তি হিসেবে জমিদার খতম বা তার ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিতরণ কখনোই শ্রেণীশত্রুকে শ্রেণী হিসেবে নিশ্চিহ্ন করার পন্থা হতে পারে না।**

তবে বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইন হিসেবে চারু মজুমদার স্থিরীকৃত লাইন-ই গৃহীত হয়েছিল। আর সবক্ষেত্রেই কৃষক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে শহর আর গ্রামের মধ্যে বিপ্লবের ভাবনায় অনেকটা ফারাক ছিল, নেতৃত্বের মধ্যেও সিদ্ধান্তগত একটা ব্যবধান ছিল।

নকশাল আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দ্বিধা দ্বন্দ্বের চালচিত্র আমাদের ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় নকশালপন্থীরা 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' শুরু করলেন এবং 'খতমের রাজনীতি তত্ত্ব' কলকাতাতে প্রবর্তিত হলো। কলকাতায় নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। চারু মজুমদারের শিক্ষা ছিল —

> **বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়। [দেশব্রতী; ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩৯; বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের প্রতি]**

তিনি এটাই আশা করেছিলেন যে, কলকাতার বিপ্লবী যুবকদের লড়াই বৃহত্তর শ্রমিক শ্রেণিকে উদ্বুদ্ধ করবে। গ্রাম থেকে ফিরে ছাত্র-ছাত্রী যুবকেরা নিজেদের এলাকায়, স্কুলে-কলেজে, রেড-গার্ড স্কোয়াড গঠন করবে। তাদের কাজ হবে ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকদের সপক্ষে ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করা, ১৯৭০-৭১ সালে সি.পি.আই.এর (এম.এল.) রাজনৈতিক সমর্থনে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের

মূর্তি ভাঙা হয়। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে চেয়েছিল নকশালপন্থীরা। ১৯৭০এর শেষে সি.পি.আই. (এম.এল.) তাদের 'পুলিশদের প্রতি' পুস্তিকায় ঘোষণা করেন যে — হয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করো; অথবা নকশালবাদীদের হাতে মৃত্যুবরণের ঝুঁকি নাও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অসীম রায়ের 'অসংলগ্ন কাব্য' —

> **কৃষিবিপ্লবের চেহারাটা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল শহরের আজগুবি অ্যাকশানে। এই অ্যাকশানে আমাদের অঞ্চলের প্রধান শিকার সূর্যের মায়ের স্কুল।... 'পুলিশ মারো অস্ত্র কাড়ো' দেয়ালে দেয়ালে এই শ্লোগান অনুসরণ করে আমাদের অঞ্চলের তরুণরা চরম নৃশংসতার কতগুলি পুলিশ অফিসারকে হত্যা করলে। ছেলের সামনে বাপের, স্ত্রীর সামনে স্বামীর সেসব মৃত্যু প্রকাশ্য রাজপথে, দিনের আলোয়। কিন্তু লোকে টুঁ শব্দটি করলে না।**

হত্যার এই দীর্ঘ তাণ্ডবলীলা চলার পর ১৯৭১এর শেষে নকশাল আন্দোলনের গতি একটু প্রতিহত হয়। কিন্তু তার মধ্যেই চলে গেছে প্রায় ছ'হাজার তরুণ সতেজ প্রাণ।

সাহিত্য যেহেতু 'creative art'; তাই সাহিত্যকে শুধুমাত্র তত্ত্বের আশ্রয় করলে চলবে না। সাহিত্যকে অনেক তর্ক-বিতর্ক তুলে ধরতে হয়। মানুষ, মানবিকতা, মানবজীবন ও মানবচরিত্রের ভালো-মন্দের হিসেব-নিকেশ বোঝাতে হয়। ষাট-সত্তরের দশকে বাংলা ছোটোগল্প-উপন্যাসে অনেক লেখকেরই হাতে উঠে এসেছে নকশাল আন্দোলনের তত্ত্ব ও তথ্য কেন্দ্রিক লেখালেখি — দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নানা চালচিত্র। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৩) নকশাল আন্দোলনের আপাত ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশ্রেণির জীবনকথা। মহাশ্বেতা দেবী সমাজ ও রাষ্ট্রের দিকে যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, তা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্রতীর মা সুজাতার জবানিতে —

> **ব্রতী কি একটি সংখ্যা অর্থাৎ ১০৮৪?**

মা সুজাতার অন্বেষণ আসলে ব্রতীর আত্মপরিচয় খুঁজে বের করা। ব্রতীর অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখোমুখি! কারণ ব্রতী মৃত এবং একই সঙ্গে ব্যর্থ।

বাংলাদেশের শত শত মায়েরা ব্রতীর মতো সন্তানের জন্ম দিয়ে কি সত্যিই গর্বিত? না কি গর্ভের সন্তানের ব্যর্থতা তাদের কুরে কুরে খায়? নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়? আত্মক্ষরণের যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছে ব্রতীর মা সুজাতা। সুজাতার কান্নায় আছে প্রতিবাদের ধারা, শোকের আর রক্তের জলছবি। মহাশ্বেতা দেবী সত্তরের দশকের নিরাপত্তাহীনতাকে, ঘুণ ধরা সমাজের প্রতিটি স্তরকে 'হাজার চুরাশির মা'তে তুলে ধরেন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের রেখাচিত্রে।

আন্দোলনের শরিক হয়ে ব্রতীর নাম বদলে যায় — খুন হওয়া শবদেহগুলোর মধ্যে — '১০৮৪' সংখ্যায় পরিণত হয়। এই মৃতদেহগুলোর কথা সমাজ ভুলে যাবে একদিন ঠিকই, কিন্তু সুজাতাদের অনুসন্ধান শেষ হয় না। ছেলের মৃত্যুদিনে সুজাতা পূর্ণতম মাতৃত্বের খোঁজে ঘুরে বেড়ান। ব্রতীর প্রেমিকা নন্দিনীর কাছে গিয়ে খোঁজেন আন্দোলনকারীদের শিকড়টাকে। নন্দিনী আর সুজাতার কথাবার্তায় উঠে আসে যারা বেঁচে রইল, আন্দোলনের সেই জীবিত শরিকদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। দেখা যায়, নন্দিনীও পুলিশি অত্যাচারে প্রায় অন্ধ। সলিটারি সেলে দীর্ঘ সময় বন্দী থেকে শহর কলকাতার ওপর বিশ্বাস সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে সে। সমাজ তাদের সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্রতীর মার মৃত্যু প্রতীকী — মৃত্যুর মধ্যে ব্রতী ও মা এক হয়ে যায়। লাশ-কাটা-ঘরে শব দেখেছিলেন সুজাতা, শ্মশানে দেখেছেন মানুষের মাথা কোটাকুটি, শুনেছেন শুধু কান্না — সুজাতার মনে প্রশ্ন জাগে —

> **পৃথিবীটা কি শুধু মৃতদের জন্য তৈরি, যে মৃতরা খায়, ঝগড়া করে, লোভ ও লালসায় উন্মত্ত হয়?... সব কীট দষ্ট, ব্যাধি দুষ্ট, পচাধরা, গলিত ক্যানসার। মৃত সম্পর্কের জের টেনে বেঁচে থাকার ভান করছে।**

'হাজার চুরাশির মা' যেমন শহরকেন্দ্রিক আন্দোলনের আখ্যান, তেমনই প্রান্তিক সমাজের আখ্যান রচনা করেন আর এক ধরনের ন্যারেটিভে 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৭৮) আখ্যানে। রাষ্ট্রের দ্বিচারিতার স্পষ্ট ছবি মহাশ্বেতা বসাই টুডু'র চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেন। প্রান্তিক জীবনের মহা-আখ্যান রচিত হয় মহাশ্বেতার কলমে — ক্ষুধা-আশ্রয়-বস্ত্র একমাত্র প্রশ্ন হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থল ১৯৬৭তে নকশালবাড়িতে আগুন জ্বলা — বসাই টুডু কিষাণ সভা পরিত্যাগ করে। কিন্তু কেন? বসাই বলে:

ভেবে দেখলাম; চৌচাল্লিশ বয়স হলু, আমু খেতমজুর রইলম। অ্যানেক মিটিং করলাম, কনফারেন্সে গেলম, কিন্তুক খেতমজুরের আসান দেখলম না... চৌষট সালে পার্টি ভাগ হলু। ভাগ হক, সভে কম্‌নিস্‌।... তবে বুঝ বসাই খাস খায় না, ধানের ভাত খায় — তাথে আমু ভেবে ল্যিছু কম্‌নিস্‌ হয়্যে কাম করমে পারি। তুমাদের কম্‌রেট্‌ বলথে পারি, কিন্তু যখন আমু খেতমজুর তখন তুমরাও মোক্‌ লাথ মারবু। ভুখা মানুষ লয়্যেই খেলা ভাল খেল নাই হে।

'ভুখা মানুষ'কে নিয়ে 'খেলা' ভাল খেলা নয় — এটাই সবচেয়ে বড়ো সত্যি। শ্রেণিবিপ্লবের তত্ত্ব বুঝে বা না বুঝে এই প্রান্তিক মানুষগুলো মার্কসীয় বিপ্লবের সহযোগিতার ধারণা থেকে সরে এসেছিল। তারা পরিষ্কার বুঝেছে মিটিং-মিছিল করে কিছু লাভ হবে না — তাতে ওই ভাগচাষীদের পেট ভরবে না। খেতমজুরকে খেতের ফসলের ভাগ দিতে হবে — 'ভুখা' মানুষকে আর 'ভুখা' রেখে বিপ্লবের তত্ত্ব বা পার্টি লাইন বোঝালে চলবে না। এখানেই নকশাল আন্দোলনের মধ্যেকার একটা ফাটল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মহাশ্বেতা। স্বভাবতই পার্টি লাইন অনুযায়ী বিপ্লবের পরিকল্পনা ও প্রয়োগের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া তৈরি হয় না — সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়, হঠকারিতাই অনেক সময় বেশি করে চোখে পড়ে। পরিণতি হয়েছে মৃত্যু বা অতৃপ্তির যন্ত্রণা নিয়ে অথবা শোকমিছিলের শরিক হয়ে বেঁচে থাকা। মহাশ্বেতার কলমে বর্ণিত হয়েছে কিছু সৎ মানুষের, কিছু প্রকৃত বিপ্লবীর জীবন বিশ্বাস হারানোর যন্ত্রণায় ব্যর্থ হয়ে গেছে। কলকাতাকেন্দ্রিক জীবন সমস্যা; অন্যদিকে গ্রামের কৃষকদের বিপন্ন অবস্থান — ব্রতী আর বসাই টুডু যথাক্রমে এ দু'য়ের প্রতিনিধি।

জীবিকা সঙ্কটের প্রশ্নে, স্বাধীনতার প্রশ্নে উভয়েই একই অবিশ্বাসের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। নকশাল আন্দোলনে প্রসঙ্গো প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির আখ্যান রচনা করে মহাশ্বেতা দেবী পাঠকের চিহ্ন কাছে রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্যকারিতা বিষয় প্রশ্ন রেখে লেখা শেষ করেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। মহাশ্বেতা দেবী, 'হাজার চুরাশির মা', সপ্তদশ মুদ্রণ, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ২০০৬
২। অনিল আচার্য সম্পাদিত 'সত্তর দশক', প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ
৩। অনিল আচার্য সম্পাদিত 'সত্তর দশক', দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ
৪। অরুণ মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', 'বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর ১৯২৩-১৯৯৭'
৫। প্রদীপ বসু, 'নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ', 'কিছু পোস্ট-মর্ডান ভাবনা', প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ১৯৯৮
৬। অসীম রায়, 'অসংলগ্ন কাব্য', প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ১৯৭৩
৭। মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪১০, এপ্রিল ২০০৩

লেখক পরিচিতি: ড. বিদিশা সিন্‌হা, সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ